ষষ্ঠ অধ্যায়
শব্দার্থতত্ত্ব (Semantic)

কালের পরিবর্তন ও ভাষার প্রবহমানতার জন্য শব্দার্থের পরিবর্তন সাধিত হয়। কালের বিবর্তনে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাতেই শব্দ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিত্যাগ করে নিত্য নতুন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই পরিবর্তন বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়। শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থ সংকোচ ও অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম—শব্দার্থ পরিবর্তনের এই তিন ধারাই আলোচ্য কথ্যভাষায় উপস্থিত।[১] এই কথ্যভাষার শব্দার্থের পরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তনের ধারাগুলি সূত্রাকারে আলোচনা করা হল—

১. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ[২] :

১.১ আলংকারিক প্রয়োগ :

প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধার মাধ্যমে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। আলংকারিক প্রয়োগে শব্দের প্রতি ক্ষেত্রেই দুটি অর্থ প্রকাশ পায়—একটি বাচ্যার্থ, আর অন্যটি শব্দের বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অর্থ সংশ্লেষের মাধ্যমে নতুন ভাবার্থ লাভ করে। যেমন—

১. **মছ্‌লি খামু রুহি ভাকুর**
ভাতার ধোরমু গায়ের ঠাকুর।

(বাচ্যার্থ—মাছ খাবো রুই কাতল, প্রেমিক/স্বামী ধরবো গ্রামের ঠাকুর)। এখানে 'ঠাকুর' শব্দটি দ্বারা উচ্চবর্ণীয়, ধনী, উচ্চবিত্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে 'ঠাকুর' শব্দটি তার মৌল অর্থ অতিক্রম করে এক নতুন অর্থ প্রকাশ করছে।

২. **অ্যাইসে যদি গতিকের কাল,**
হরিণে চাটে বাঘের গাল।

(বাচ্যার্থ—যদি গতিকের কাল এসে উপস্থিত হয়, তখন হরিণ বাঘের গাল চাটে)। ব্যঙ্গর্থ—'চাটে' অর্থাৎ তোষামোদ বা বন্ধুত্বভাবাপন্ন মনোভাব।

৩. **শাপের লিখ্যা,,**

আর বাঘের দ্যাখা।

(বাচ্যার্থ—শাপে কেটে মৃত্যু লেখা থাকে, আর বাঘের কাছে মৃত্যু দেখা হলে)। ভাবার্থ হল—'লিখ্যা' অর্থাৎ কপালের লিখন বা ভাগ্য; 'দ্যাখা' অর্থাৎ দেখতে পাওয়া বা দেখা পেলে।

৪. **পহেলা বেটা পুষে,**

আগ্‌লা বেটা চুষে।

(বাচ্যার্থ—প্রথম ছেলে পুষে, পরবর্তীকালে জন্মানো ছেলে চুষে)। এখানে ভাবার্থ 'পুষে' অর্থাৎ লালন-পালন করে বা বৃদ্ধি করে; 'চুষে' অর্থাৎ ভোগ করে বা নিঃশেষ করে। প্রথম (পহেলা) বংশের ছেলে বৃদ্ধি করে ও ধরে রাখে এবং পরবর্তীকালে জন্মানো (আগ্‌লা) ছেলে ভোগ করে।

৫. **যারঘাউ তার ব্যথা লাই,**

পাড়া পড়শির নিন্ লাই।

(বাচ্যার্থ—যার আঘাত/ক্ষত তার ব্যথা নেই, পাড়া প্রতিবেশীর ঘুম নেই)। ভাবার্থ হল—'ব্যথা' অর্থাৎ চিন্তা বা উত্তেজনা; নিন্ অর্থাৎ স্বস্তি। যার অসুবিধা তার চিন্তা নেই, পাড়া প্রতিবেশীদের স্বস্তি নেই।

৬. **ধম্মপুত্তুর যুধিষ্টির—** ব্যাঙ্গার্থ—সত্য বলার ভানকারী বা মিথ্যেবাদী। স্বভাবগত চরিত্রকে বোঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

৭. **মামাবাড়ি—** ভাবার্থ—হাজত বা জেলখানা। মামাবাড়ি (মাতুলালয়) অত্যন্ত প্রিয় জায়গা কিন্তু অন্যায়কারীর শাস্তিস্বরূপ জেলখানা অর্থাৎ মামাবাড়ি ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়।

৮. **বাড়ি মাথাত্ উঠায় রাখা —** অর্থাৎ যার দৌরাত্ম্যে বাড়ির সবাই অতিষ্ট হয়ে ওঠে। বাড়ি

মাথায় উঠিয়ে রাখা—অর্থাৎ দৌরাত্ম্য অর্থে প্রযুক্ত।

৯. সেলামি— ভাবার্থ—ঘুষ। ঘুষ শব্দটিকে চাপা দেওয়ার জন্য বা প্রকাশ না করার জন্য পোশাকি শব্দ ' সেলামি' ব্যবহার করা হয়।

১০. ভাত-কাপড় দেওয়া— ভাবার্থ—শুধু ভাত আর কাপড় দেওয়া নয়, যাবতীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ সহধর্মিনীর যাবতীয় জীবনের দায়িত্ব নেওয়া।

১১. ঢপের চপ— ভাবার্থ—মিথ্যে বলা। এখানে ঢপ—ধাপ্পাবাজ ও চপ—ফাঁপা। অর্থাৎ ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য ধাপ্পা বা মিথ্যে।

১.২ সৌজন্য ও সুভাষণ রীতি :

১. মুখিয়া— অর্থ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। মুখ হল মানব দেহের প্রধান দর্শনীয় বা সৌন্দর্যের জায়গা। যিনি গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রধান ব্যক্তি তিনিই হলেন গ্রামের মুখ অর্থাৎ 'মুখিয়া'। আবার 'মুখ্য' শব্দটি থেকেও 'মুখিয়া' শব্দটির আগমন ঘটতে পারে।

২. জি— শব্দটি সংস্কৃত 'জীব' শব্দজাত। আলোচ্য কথ্যভাষায় 'জি' শব্দের অর্থ হল মহাশয়। কথ্যভাষায় 'জি' শুধুমাত্র সম্মানার্থে নয় সম্বোধন অর্থেও ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ বা সম্মতি সূচক শব্দ হিসাবেও 'জি'-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৩. বাহাদুর— ফারসী শব্দ 'বহাদুর' থেকে 'বাহাদুর' শব্দের উৎপত্তি। বাহাদুর শব্দের অর্থ বীর বা কৃতী। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় দারোয়ান শব্দের পরিবর্তে বাহাদুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বার বা ফটক রক্ষার কাজ হল বীরের তাই এই পেশাকে সম্মান জানিয়ে বলা হয় বাহাদুর।

৪. বাত্‌রুম পাওয়া— বাত্‌রুম < বাথরুম < (Bathroom) অর্থাৎ স্নানঘর পাওয়া। এর

অর্থ হল মলমূত্রাদির বেগ পাওয়া।

৫. গোরিবখানা— গরিবের বাড়ি অর্থাৎ নিজের বাড়ি। বর্তমানে অট্টালিকাকেও গরিবখানা বলা হয়।

৬. বাড়্তে একবার পদধূলি দ্যাবেন— অর্থাৎ 'সশরীরে উপস্থিত থাকা।' বিনয় ভাব প্রকাশ করার কৌশল হিসেবে সুভাষণ রীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

১.৩ সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা (Taboo) :

১. শাপ্ (সাপ)—লতা, পুকা

এই কথ্যভাষায় রাত্রিবেলা সাপ শব্দটি উচ্চারণ না করে তার পরিবর্তে লতা বা পুকা শব্দটির ব্যবহার করা হয়। লতা যেমন অবলম্বন পেলে জড়িয়ে উপরে উঠতে পারে সাপও তেমনি। লোকবিশ্বাস মতে রাত্রিবেলা 'শাপ্' শব্দ উচ্চারণ করলে সাপ জাগ্রত হয়ে যায়।

২. হলুদ—রং

রাত্রিবেলা গৃহস্থ নারীরা রন্ধনে প্রয়োজনীয় মশলা 'হলুদ' শব্দটি ব্যবহার করেন না। তার পরিবর্তে 'রং' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। রং অর্থাৎ বর্ণ। আর হলুদ হল একটি বর্ণ বা রং। লোক অন্ধসংস্কার হল—রাত্রিবেলা কোনো নারী যদি হলুদের পরিমাণ চিনে নিতে পারে তাহলে তাকে ড্যাহিনী (ডাইনী) বলে ধরে নেওয়া হয়।

৩. চুন্—দৈ

গৃহস্থ বাড়িতে সন্ধ্যার পর 'চুন্' শব্দটি উচ্চারণ করা যায় না। তার পরিবর্তে 'দৈ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'দহি' থেকে 'দৈ' শব্দটির উৎপত্তি। দৈ-এর রঙ সাদা আর চুনেরও তাই। লোকবিশ্বাস হল—রাত্রিবেলা চুন শব্দ উচ্চারণ করলে গৃহস্থের অমঙ্গল সাধিত হয়।

৪. বসন্ত রোগ—মায়ের দয়া

গ্রাম্য, ভীত ও সংস্কারাবদ্ধ সাধারণ মানুষ 'বসন্ত' শব্দটি উচ্চারণ না করে 'শীত্‌লা মায়ের দয়া' বা 'মায়ের দয়া' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

এই জেলায় গ্রাম্য নিরক্ষর নারীরা ও শহুরে শিক্ষিত নারীরাও স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর ইত্যাদি গুরু জনদের নাম মুখে উচ্চারণ করেন না। তারা স্বামীকে ও, তিনি, সে বা ছেলে-মেয়ের নামের পর আব্বা বা বাবা যুক্ত করে ডেকে থাকেন। যেমন—সালমার আব্বা বা পূজার বাবা। আবার গুরুজনদের নামের সঙ্গে মিল আছে এমন নাম বা প্রতীকী নাম ব্যবহার করে থাকেন।

১.৪ পরিবেশ ও সমাজগত পরিবর্তন :

১. শের্— ফারসী 'শীর' শব্দের অর্থ হল সিংহ। হিন্দি ' শের' শব্দের অর্থ সিংহ। কিন্তু এখানকার সমাজে 'শের' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে বাঘ।

২. হারাম্— শব্দের মুসলিম শাস্ত্রানুযায়ী অর্থ হল অপবিত্র, অবৈধ বা নিষিদ্ধ। এখানকার গ্রাম্য সমাজে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি অবস্থান করেন। মুসলমান সমাজে শূকর বা শূয়োর ধর্মীয় ভাবে নিষিদ্ধ বস্তু। তাই তারা শূকরকে হারাম্ বলে। শূকর হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ নয় কিন্তু সামাজিক সহাবস্থানের ফলে মুসলমানের পাশাপাশি হিন্দুরাও শূকরকে 'হারাম্' বলে থাকে। দুটি সমাজে 'হারাম্' শব্দের অর্থগত তাৎপর্যের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

৩. বেরছানি— এটি একটি দেশী শব্দ। বেরছানি শব্দের অর্থ হল মহিলা বা নারী। বিশেষত মধ্য বয়স্কা নারী বা রমণী। এই শব্দটি শুধুমাত্র এই সমাজেই সীমাবদ্ধ, আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

১.৫ সম্বোচ্চারিত শব্দের অর্থ পার্থক্য[৩] :

আমানি— ১. পান্তা ভাত—আমানি খ্যালে বহুৎ নিন্ পায়।

২. রস—উয়াক্ মারি আমানি বার করি লিবো।

উত্তর— ১. জবাব—চিঠির উত্তর আভিতালাক্ নি আসিল্।

২. দিক্—উত্তরে শিথ্যান্ দে।

কলম্— ১. লেখনী—কলম্টা লিয়্যে আয়।

২. গাছ কলম্—কলম্ গাছত্ আম ধোরিচে।

কাণ্ড— ১. ব্যাপার—কি কাণ্ড মি তো বুঝবার নি পাছু।

২. অধ্যায়—সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে কহাছিস সীতা রামের মোসি।

৩. কুকীর্তি—উয়ার কাণ্ড শুনে মোর ঘিন্ পায়।

কাল— ১. কল্য—কাল মি ঘুরবার তানে্ ফুফির বাড়ি জাম্।

২. সময়—বিহ্যানকালে জমিত্ যাবা হোবে।

কথা/কাথা— ১. প্রসঙ্গ—সবগোর মুখেই আজ হরতালের কথা/কাথা।

২. প্রতিশ্রুতি—উয়ায় যেখুন কথা দেছেন তেখুন আর সোচবার কি ছে।

৩. অনুরোধ—হামার একটা কাথা তোমাক্ রাখবাই হোবে।

৪. গল্প—নানী হামসাক্ আভি ভূতের কাথা কহাবে।

কোল্জ্যা— ১. প্রাণ— কৈ মাচের কোল্জ্যা বড়।

২. যকৃত— কোল্জ্যা খাইতে বুহৎ সাদ।

খুন্— ১. রক্ত—খুন দ্যাখলে মোর শির চক্রায়।

২. হত্যা—খবর আসিল, রমজান খুন হয়্যা গেছে।

খাল্— ১. গর্ত—ই বছর খালে বহুৎ জিঅল মাছ ধরা পড়িছে।

২. চামড়া—মি উ শালাক্ মারি পিঠের খাল্ উঠায় লিম্।

গুন্— ১. পূরণ—ইডা সংখ্যাকে তিন দিয়া গুন্ কর।

২. সুফল—বিগ্গেনের বহুৎ গুন ছে।

গুনা— ১. পাপ— যে গুনা করিবে উয়াক শাস্তি পাবা হোবে।

২. লোহার তার—দুকান সে গুনা কিনে লিয়ে অস।

ঘাটা— ১. নাড়াচাড়া—শালুন্টা জাদা ঘাটাঘাটি কোরিশ না।

২. রাস্তা—কদ্দুসের বাড়ি কুন্ ঘাটা দিয়া যাবা হোবে?

৩. লোকসান—ই বছর ব্যবসায় বহুৎ ঘাটা পড়িল্।

চাল— ১. চাউল—ঘরত্ চাল নি ছে।

২. আচ্ছাদন—কাল্কার বাদলায় হামার ঘরের চাল কুন্টে উড়ি চলি গেইছে।

ছাতা— ১. নোংরা—উয়ার গায়ে ছাতা ভত্তি।

২. ছত্র—বিষ্টির সুম্যা ছাতা, আর শীতের সুম্যা কাথা।

জাল্— ১. ভেজাল—জাল ওসুধে বাজার ছায়্যা গেছে।

২. ফাঁদ—জালে মছ্লি আটক পড়িছে।

৩. জ্বাল—খরি দিয়্যা আখাতে জাল্ দে।

৪. নকল—কাল একটা জাল নোট আসিছিল্।

ডণ্ড (দণ্ড)— ১. শাস্তি—গুনেগারক্ ডণ্ড দিবা জরুরি।

২. লাঠি—ডণ্ড দিয়্যা আমগালা পাড়্েক।

৩. সময়ের বিভাগ—উ হামার চোখের মণি, উয়াক এক ডণ্ড এক্লা ছাড়িম, মি ভাবতেই পারি না।

তিল্— ১. শস্য—জমিত আচ্ছা তিল্ হবে।

২. দেহের তিল—উয়ার গায়ে খুবি তিল্।

দানা— ১. শস্য—যাদা বিষ্টিতে দানা আচ্ছা নি হৈছে।

২. আহার—দানাপানির ইনতেজাম নি হলে বাচবা নি পারিম্।

ধার— ১. ঋণ— তোক মি আর ধার দিবো ল্যাই।

২. ধারালো—বটিটার ধার নাই।

প্যাট্— ১. উদর—প্যাট্ ভর্যা খায়ে লে।

২. গর্ভ—উ বেরছানি প্যাট্ সে ছে।

বাড়ি— ১. ঘর—হামার বাড়িত্ একবার অসবেন।

২. আঘাত—ডণ্ডের বাড়ি দিয়্যা তোক ঘায়েল করি দিম্।

ভাব— ১. ভালোবাসা—মায়ে-ঝিয়ে খুব খাব।

২. আভিপ্রায়—এইবার মি তোর ভাবখান্ বুঝবা সাক্ছি।

মাথা— ১. মস্তক—হামার মাথাত্ যাদা বুদ্ধি।

২. নেতা—নিমাইবাবু হামসার মাথা।

হক্— ১. দাবী—ইডা গাছত্ হামসার হক্ ছে।

২. আসল—মুই তোমারঘে হক্ কথা কহাছি।

হার— ১. মালা— মেলা থিক্যা মোর তনে একটা হার কিনে লিয়ে আসিস।

২. পরাজয়—তম্রা জোট করি মোক হারায় দিলে।

১.৬ বিশিষ্টার্থক শব্দের অর্থ পাথক্য[৪] :

চলিত বাংলার ন্যায় আলোচ্য কথ্যভাষাতেও অনেক বিশিষ্টার্থক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শব্দ বা শব্দ সমষ্টিগুলি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে কোনো ইঙ্গিতপূর্ণ সূক্ষ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। শব্দ বা শব্দ সমষ্টি প্রয়োগের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

গা (দেহ) :

১. গা তোলা (উঠা)— ব্যালা হয়্যা আসিল্, বহুৎ দুর যাবা হোবে তম্রা এবার গা তোলেন। (বেলা হয়ে আসলো, অনেক দূর যেতে হবে, আপনারা এবার উঠুন।)

২. গায়ে হাত তুলা (প্রহার)— কচি ছুয়াপুয়ার গায়ে হাত তুলা নিশেদ। (অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের প্রহার করা নিষেধ।)

৩. গায়ে মাখা (সহ্য করা)— মুরুব্বিদের কাথার বিরোধ করিস না, গায়ে মেখে লে। (বড়দের কথার বিরোধ করিস না, সহ্য করে নে।)

৪. গায়ে (তীরে, পাশে)— মসজিদের গায়েই হামসার ঘর। (মসজিদের পাশেই আমাদের ঘর।)

৫. গা করা (মনোযোগ দেওয়া)— উয়ার বাজে কথায় গা কোরিশ্ না, তুই ঠিকেই ছিস। (তার বাজে কথায় মনোযোগ দিস না, তুই ঠিকই আছিস।)

৬. গা ঢেকা (লুকিয়ে থাকা)— দেনার দায়ে অর কেত্‌লা দিন গা ঢেকা দিয়্যা থাকবি? (দেনার দায়ে আর কতদিন লুকিয়ে থাকবি?)

৭. গায়ের ঝাল্‌ (আক্রোশ)— হক্‌ কথায় খোচা খায়্যা সামান্‌ ভাঙ্গে গায়ের ঝাল্‌ মিটাশ না। (উচিত কথায় খোচা খেয়ে জিনিস-পত্র ভেঙ্গে আক্রোশ মেটাস না।)

৮. গা ঝাড়া (জড়তা পরিহার)— গা ঝাড়া দিয়্যা উঠেক্‌, কে কি কহালো তাত্‌ তমার কি। (জড়তা পরিহার করো, কে কি বলতো তাতে তোমার কি।)

৯. গা মেলা (নিশ্চেষ্ট)— সুম্যা থাকতে কৌশিশ কর পহেলেই গা মেলে দিস না। (সময় থাকতে চেষ্টা কর আগেই নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়িস না।)

১০. গা সওয়া (অভ্যস্ত)— হরদিন রাত্তিব্যালা কারেন্‌ যাওয়া গা সওয়া হয়্যা গেছে। (প্রতিদিন রাত্রিতে কারেন্ট যাওয়া অভ্যস্ত হয়ে গেছে।)

১১. গায়ে কাটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া)— ছুট্টু ব্যালা ভূত- পেত্নীর কিস্‌সা শুনে গায়ে কাটা দিতো। (ছোটবেলা ভূত- পেত্নীর গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হতাম।)

১২. গায়ে থুতু (ঘৃণা)— তোর ইডা গুনার বাত্‌ শুনে সবগোই তোর গায়ে থুতু মারবে। (তোর এই পাপের কথা শুনে সবাই তোকে ঘৃণা করবে।)

১৩. গায়ে ফু (দায়িত্ব এড়ানো)— হাম্‌রা কাম করি মরিম্‌ আর উ সাব্‌ গায়ে ফু দিয়্যা বেড়াবেন, তা হবেক ল্যাই। (আমরা কাজ করে মরবো আর ওই সাহেব দায়িত্ব এড়িয়ে বেড়াবেন, তা হবে না।)

১৪. গায়ে ফোস্‌কা (যন্ত্রণা)— কুছু না কহালেই ভালো। আর হক্‌ কথায় গায়ে ফোস্‌কা

লাগে। (কিছু না বললেই ভালো আর উচিৎ কথায় যন্ত্রণা হয়।)

১৫. গায়ে লাগা (স্বাস্থ্য হওয়া)— বাপ-মা মর‍্যা পুলাটার এবার দানা পানি একটুক্যা গায়ে লাগ্‌ছে। (বাপ-মা মরা ছেলেটার এবার আহারে একটু স্বাস্থ্য হয়েছে।)

১৬. গা উজার (সর্বস্ব দান)— মনোজবাবু ইস্কুলের ভালায় গা উজার করে দ্যাছেন। (মনোজবাবু স্কুলের উন্নতিতে সর্বস্ব দান করেছেন।)

২. শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা[৫] :

২.১ অর্থের বিস্তার : বিশেষ বস্তুর ব্যাপক অর্থ লাভ

আলোচ্য কথ্যভাষায় বস্তু বিশেষের গুণ, বৈশিষ্ট্য, অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে এমন অনেক শব্দ রয়েছে। যেমন—

১. নোখ্‌খি— মূল শব্দ 'লক্ষ্মী'। শব্দটির আদি অর্থ 'ধনদেবী'। প্রচলিত ধারণা এই দেবী 'অচঞ্চলা' অর্থাৎ 'শান্তস্বভাবা'। কিন্তু এখানে 'লক্ষ্মী' শব্দের অর্থের বিস্তার ঘটে 'শান্ত স্বভাব যুক্ত যে-কোনো ছেলে-মেয়েকে বোঝানো হয়।

২. জাউ— সংস্কৃত শব্দ 'যবাগু' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'যবের মণ্ড'। তা থেকে আগত বাংলা শব্দ 'জাউ'। বর্তমানে এই অঞ্চলে জাউ শব্দের অর্থ 'পানীয় মণ্ড' কে অতিক্রম করে চালের বা খুদের জাউকেও বোঝানো হয়ে থাকে।

৩. গাড়োল্— শব্দটি সংস্কৃত 'গড্ডল' শব্দজাত, যার অর্থ মেঘ বা ভেড়া। কিন্তু এই কথ্যভাষায় ভেড়ার সাদৃশ্যে মূর্খ, বোকা বা অকর্মণ্য ব্যক্তিকে 'গাড়োল্' বলা হয়।

৪. চ্যুতিয়া— সংস্কৃত চ্যুত [√ চ্যু + ত (খ)] শব্দজাত, যার অর্থ ভ্রষ্ট, পতিত। কিন্তু এখানে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীকে বা ভীরু ব্যক্তিকে 'চ্যুতিয়া' বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে গালি-গালাজ (Slang)-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়।

৫. পোরসু— সংস্কৃত 'পরশ্ব' শব্দের অর্থ 'আগামী কালের পরদিন'। কিন্তু এই অঞ্চলে 'গতকালের আগের দিন' অর্থেও 'পোরসু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬. পিড়ন্— শব্দটি ফারসী 'পয়রাহান' শব্দজাত। যার অর্থ ঢিলে-ঢালা জামা বিশেষ। কিন্তু এখানে যে কোন জামাকেই পিড়ন্ বা পিড়ান্ বলা হয়।

৭. মিজ্জাফর— অনেক সময় বিশেষ ব্যক্তি নাম বিশেষ ভাবের পরিচয় দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মীরজাফর বাংলার নবাব সিরাজদৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, আর তাতেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসনকে হস্তান্তর করেছিল। তাই এই অঞ্চলে 'মিজ্জাফর' হল বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দ। এখানে শব্দের অর্থের প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

২.২ অর্থের সংকোচ : গৌণার্থের প্রাধান্য

অনেক সময় এই কথ্যভাষায় শব্দ তার ব্যাপকার্থকে হারিয়ে গৌণার্থকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ শব্দের অর্থের সংকোচ সাধিত হয়। এই প্রকার শব্দের উদাহরণ হল—

১. শেরাব— শব্দটি আরবী, ফারসী 'শরাব' শব্দজাত। যার অর্থ যে কোনো পানীয়। কিন্তু এই অঞ্চলে ' শেরাব' শব্দটি মদ রূপে চিহ্নিত। পানীয় মদকে এখানে শেরাব বলা হয়।

২. শিন্নি— শব্দটি ফারসী 'শীরীনী' শব্দজাত, যার অর্থ প্রসাদ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শিন্নি বা প্রসাদ রূপে চিনি, বাতাসা, গুড় ইত্যাদি দেওয়া হয়। কিন্তু এই অঞ্চলে চিনি বা গুড় জাতীয় মিষ্টান্নকে শিন্নি বলা হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে এই শব্দটিকে অর্থের সংক্রমও বলা যেতে পারে।

৩. ভালাবুরা— বাংলা শব্দ ভাল > ভালা, হিন্দি শব্দ 'বুরা' অর্থ মন্দ বা খারাপ। ভালা (ভাল) + বুরা (খারাপ, মন্দ) = ভালমন্দ। শব্দটির মূল অর্থ ভালো এবং মন্দ। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় দুটির যে কোনো একটি অর্থকে বোঝায়। কখনো ভালো অর্থে আবার কখনো

খারাপ বা মন্দ অর্থে 'ভালাবুরা' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪. মিন্‌শ্যা— শব্দটি সংস্কৃত 'মনুষ্য' শব্দজাত। যার অর্থ যে কোনো মানুষ। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় নারীরা। শুধুমাত্র বিবাহিত পুরুষকে ব্যাঙ্গার্থে 'মিন্‌শ্যা' বলে থাকে। এখানে শব্দটির অর্থের সংকোচ সাধিত হয়েছে।

৫. থান— 'স্থান' থেকে 'থান' কথাটির উৎপত্তি, যার অর্থ যে কোনো জায়গা। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় 'থান' বলতে শুধুমাত্র ' দেবতার স্থান'কেই বোঝানো হয়। অর্থের গোণার্থ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

২.৩ অর্থের সংক্রম : নতুন অর্থে শব্দের প্রয়োগ

অনেক সময় শব্দ তার মূল অর্থকে পরিহার করে অন্য কোনো নতুন অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন অর্থের সংক্রম ঘটে। আলোচ্য কথ্যভাষাতেও এই প্রকার শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১. কিস্‌সা— শব্দটি আরবী 'কিস্‌সা' শব্দজাত। 'কিস্‌সা' শব্দের অর্থ কাহিনী। কিন্তু এই অঞ্চলে 'কিস্‌সা' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে পরনিন্দা বা কুৎসা। শব্দটির অর্থের সংশ্লেষ ঘটেছে।

২. নাং— শব্দটির মূল উৎস নগ্ন। নগ্ন > নঙ্গ > নাং, 'নগ্ন' শব্দটির অর্থ হল উলঙ্গ। 'নাং' শব্দটি আলোচ্য কথ্যভাষায় হীনার্থে 'উপপতি' বা নিন্দনীয় 'অবৈধ পতি' অর্থের ইঙ্গিতবাহী। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই শব্দটির দ্বারা 'প্রেমিক'-কেও বোঝানো হয়, তা অবশ্যই হীন অর্থে।

৩. চাম্‌চে— শব্দটির প্রাথমিক অর্থ হল রান্নার কাজে ব্যবহৃত ' ছোট হাতা' বা চামচের চেয়ে বড় আকার বিশিষ্ট রন্ধন উপকরণ বা সামগ্রী। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় 'চামচে' শব্দের অর্থ হল ' তোষামোদকারী', 'অতি অনুগত' ব্যক্তি। এখানে শব্দের অর্থ সংক্রম ঘটেছে।

৪. **কোল্‌জ্যা**— শব্দটি হিন্দি 'কলেজা' শব্দজাত, যার অর্থ প্রাণীর ' মেটে' বা 'যকৃৎ'। কিন্তু কথ্যভাষায় ' কোল্‌জ্যা' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে 'প্রাণ'। অর্থের সংক্রমে 'যকৃৎ' বা 'হৃদপিণ্ড' থেকে 'প্রাণ' অর্থে শব্দটির প্রযুক্ত হয়।

৫. **ফাজিল**— শব্দটি আরবী 'ফাজিল' শব্দজাত, যার অর্থ 'পারদর্শী'। কিন্তু এই কথ্যভাষায় 'ফাজিল' শব্দটি বখাটে, বাচাল, বাজে অর্থে প্রয়োগ হয়। এখানে অর্থের সংশ্লেষ ঘটেছে।

৬. **ঘড়েল**— শব্দটি হিন্দি শব্দ 'ঘড়িয়াল' থেকে উৎপন্ন। 'ঘড়িয়াল' বলতে যিনি বালুকা ঘড়ির তদারককারী সতর্ক প্রাণী। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ঘড়েল' বলতে খুব চালাক ধূর্ত ব্যক্তিকে বোঝায়।

৭. **ইমান্**— শব্দটি আরবী 'ঈমান' শব্দজাত। যার অর্থ শাস্ত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস। কিন্তু বর্তমানে এই কথ্যভাষায় শাস্ত্রানুযায়ী বিশ্বাস নয়, সত্যবাদীতার সূত্রে 'ইমান্' শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

৮. **কাফোর**— শব্দটি আরবী 'কাফির' শব্দজাত। কাফির > কাফের > কাফোর, যার অর্থ ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী বা ইসলাম বিরোধী লোক। কিন্তু এই অঞ্চলে মুসলমান সমাজে 'কাফোর' শব্দটির দ্বারা 'নিষ্ঠুর ব্যক্তি'কে বোঝানো হয়। 'জং'-গানে নিষ্ঠুর অর্থে 'কাফোর' শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৯. **খুন**— শব্দটি ফারসী শব্দজাত, যার অর্থ হল রক্ত। কিন্তু আলোচ্য কথ্যভাষায় 'খুন' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে হত্যা। শব্দটি মূল অর্থ পরিত্যাগ করে নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে।

১০. **বিশ্**— 'বিষ্' শব্দ থেকে 'বিশ্' (বিষ > বিশ্) শব্দটি এসেছে। 'বিষ' শব্দের অর্থ গরল বা হলাহল। এই অঞ্চলে ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা অর্থে 'বিশ্' শব্দটির প্রয়োগ হয়। আসলে বিষ বা গরল পান করলে শরীরে যেমন ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণার উপক্রম হয় তার থেকে 'বিশ্'-কে

ব্যথা, বেদনার প্রতিশব্দ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৬১।

২. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

ক. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ২০০৭, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

খ. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮, প্রথম সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ঘ. রফিকুল ইসলাম, ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯২, প্রথম প্রকাশ, বুক ভিউ, ঢাকা।

ঙ. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

চ. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

৩. সম্মোচারিত শব্দের আলোচনায় নিম্নোক্ত অভিধানগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

ক. কাজী আবদল ওদুদ সংকলিত—ব্যবহারিক শব্দকোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।

খ. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১ম ও ২য় ভাগ), ২০০৩, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

গ. রাজশেখর বসু সংকলিত —চলন্তিকা, ১৪১৮, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা।

ঘ. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত —সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, ১৯৯৮, সাহিত্য সংসদ্, কলকাতা।

ঙ. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড), ২০০৮, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী।

৪. বিশিষ্টার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্যের আলোচনায় নিম্নলিখিত অভিধানগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

ক. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১ম ও ২য় ভাগ), ২০০৩, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

খ. রাজশেখর বসু সংকলিত—চলন্তিকা, ১৪১৮, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা।

গ. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত—সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, ১৯৯৮, সাহিত্য সংস্দ, কলকাতা।

ঘ. সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত—সরল বাঙ্গালা অভিধান, ২০০৯, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি., কলকাতা।

ঙ. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড), ২০০৮, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী।

৫. শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা আলোচনায় নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

ক. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ২০০৭, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

খ. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ২০০৩, প্রথম সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ঘ. রফিকুল ইসলাম, ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯২, প্রথম প্রকাশ, বুক ভিউ, ঢাকা।

ঙ. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

চ. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

ছ. সুভাষ রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা, ১৩৯৫, প্রথম প্রকাশ, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

জ. Suniti Kumar Chatterjee - The Origin and Development of the Bengali Language, 1962, Calcutta University Press, Calcutta.